শিশুর প্রযুক্তি আসক্তি

আশফাক আহমেদ

খুব বেশি আগের কথা নয়, বলা যায় এক যুগ আগেও শিশু কিশোরদের খেলার সাথি ছিল স্কুল-কলেজ, পাড়া প্রতিবেশীর সমবয়সী বন্ধুরা। পুতুল, নানা ধরনের খেলনা, ছুটাছুটি, গল্প, আড্ডা, মাঠে ক্রিকেট, ফুটবল খেলে পার হতো শৈশব-কৈশোর। আর এখন শিশুদের খেলার সঙ্গী স্মার্টফোন, ট্যাব, টিভি, ল্যাপটপ ইত্যাদি। ভিডিও গেমস, কার্টুন আরো কতো কী দেখতে ব্যস্ত তারা। খাবার খাওয়াতে, কান্না থামাতে তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এভাবেই শুরু। এরপর একটা সময় শিশুদের মন শুধুই পড়ে থাকে ডিভাইসে। এক পর্যায়ে নিজের অজান্তেই হয়ে পড়ে আসক্ত।

শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য প্রথম পাঁচ বছর বয়স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে প্রথম তিন বছরকে বলা যেতে পারে 'গোল্ডেন উইন্ডো পিরিয়ড'। কারণ এই সময়েই একটি শিশুর মস্তিকের সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটে। একজন শিশু যে পরিবেশে বড় হয় তার বাকি জীবনের উপর এর প্রভাব থেকে যায়। ফলে এই সময়ে একজন শিশু যা শুনবে, দেখবে, অনুভব করবে সেগুলো অবশ্যই তার শারীরিক ও মানসিক বেড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় শ্রেণি, পেশা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা যেকোনো বিবেচনায় প্রায় সব পরিবারেই কম-বেশি নানা ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম মোবাইল ফোন, টিভি, ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি। যা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ও সহযোগী ভূমিকা রাখলেও, অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাপ্তবয়স্করা যতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তার থেকেও বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শিশুদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসক্তি। যে বয়সে নিজ চোখে দেখা পৃথিবীর নতুন নতুন সব জিনিস আবিষ্কার করবে, শুনবে, ভাববে, দৌড়াবে পড়ে যাবে আবার উঠে দৌড়াবে সে শৈশব, কৌশর যেন হারাতে বসেছে অগণিত শিশু। দিনে-রাতে শুধু চোখের সামনে ডিভাইস। কখনো টিভিতে, নইলে হাতে মোবাইল বা ট্যাব নিয়ে কিছু না কিছু দেখেই চলেছে শিশুরা। এর মাঝে শিক্ষণীয়, ভালো-মন্দ কনটেন্ট সবই রয়েছে। তাদের হাতের মুঠোয় পৃথিবী তুলে দেওয়া হচ্ছে এমন ভাবনা পুরোপুরি সঠিক নয়। এতে শিশুর জগত ছোট হয়ে ডিভাইসে আটকে যাচ্ছে। আসক্তি তার মেধা, বাস্তবিক চিন্তাশক্তি, শারীরিক বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। অনেকেই এর প্রায় সবই জানেন ও বোঝেন। কিন্তু শিশুদের এই আসক্তি থেকে ফেরাতে ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতে কতোটা করতে পারছি আমরা এই প্রশ্ন থেকেই যায়। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও জানি না করণীয় সম্পর্কে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে শিশুদের মোবাইল ফোন আসক্তি কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক জার্নাল এলসভিয়ারের জার্নাল অব ইফেক্টিভ ডিস-অর্ডারে প্রকাশিত গবেষণায় উঠে আসে, বাংলাদেশের প্রায় ৮৬ শতাংশ প্রি-স্কুল শিশু স্মার্টফোনে আসক্ত। এর মধ্যে ২৯ শতাংশ শিশুর মারাত্মক স্মার্টফোন আসক্তি রয়েছে। গবেষণায় আরো দেখা যায়, ৯২

শতাংশ শিশু তাদের মা-বাবার স্মার্টফোন ব্যবহার করে আর ৮ শতাংশ শিশুর ব্যবহারের জন্য আলাদা স্মার্টফোন আছে। বাংলাদেশের শিশুরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যা ইউনিসেফ কর্তৃক সুপারিশ করা সর্বোচ্চ সময়ের প্রায় তিন গুণ বেশি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু গড়ে প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করে। গবেষণায় শিশুর স্মার্টফোন আসক্তির কারণ হিসেবে বলা হয়, ৮৫ শতাংশ মা-বাবা তাদের সন্তানদের কম সময় দেন। ৫২ শতাংশ শিশু খেলার মাঠের অভাবে এবং ৪২ শতাংশ শিশু খেলার সঙ্গীর অভাবে স্মার্টফোনে আসক্ত হচ্ছে।

স্মার্টফোন ও অন্য ডিভাইসে শিশু-কিশোরদের আসক্তির অন্যতম কারণ বিভিন্ন ধরনের সামাজিকমাধ্যম যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি। অনলাইনে জগতে আসক্ত হলে দিন-রাতের হিসাবও থাকে না। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ইন্টারনেটে নিরাপত্তা নিয়ে শিশুরা কী ভাবে, তাদের পরিস্থিতি কী, এসব জানতে ইউনিসেফ সারা দেশে একটি জরিপ চালায়। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১১ হাজার ৮২১ ছেলেমেয়ে জরিপে অংশ নেয়। ইউনিসেফ বাংলাদেশের ওই জরিপে বলা হয়, বাংলাদেশের ৮১ শতাংশের বেশি শিশু-কিশোর সামাজিকমাধ্যমে প্রতিদিন সময় কাটায়। এদের ৯০ শতাংশই মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

এতে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম শিশুদের মধ্যে আচরণজনিত সমস্যা দেখা দেয়। অল্পতেই অনেক শিশু রেগে যায়, কেউ কেউ হতাশায় ভুগে। পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে, নতুন কারো সাথে কথা বলতে অনীহা দেখা দেয়। খাওয়ায় ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে অনিয়ম করে। এবং একটু বড় হলে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ধূমপান, মাদকাসক্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া চোখ, মস্তিষ্কসহ শারীরিক ও মানসিক নানা অস্বাভাবিকতা বাড়তে থাকে।

তাহলে শিশুদের ডিভাইস বা প্রযুক্তি আসক্তি কমানোর উপায় কী হতে পারে? প্রথমত পরিবারের সদস্য বিশেষ করে বাবা-মাকে যতোটা সম্ভব সন্তানকে সময় দিতে হবে। তাদের